বিকাশের পুজোর কলকাতা

১৯৯৬ সালের ১৯ অক্টোবর মহাসপ্তমীর দিন পাক্ষিক ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশ পায় বিকাশ ভট্টাচার্য-র পুজোর স্মৃতি ‘পুজোর কলকাতা’। পরে ২০১৩ সালে সুতানুটি বইমেলা কমিটি এই লেখাটিকে একটি সুন্দর বইয়ের চেহারা দেয়। সেই বইটিরই পাঠপ্রতিক্রিয়ায় ব্লগ-পরিচালক মৃণাল নন্দী ।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু হারিয়ে যায়। অনেক ভাল লাগা জিনিসই বড় হয়ে গেলে আর ভাল লাগে না। দুর্গাপুজোও কি সেই ভাল না লাগার তালিকার একটা? একা আমারই কি পূজোর মজাগুলো ম্যাড়মেড়ে, পানসে লাগে? আর কি মনে ধরে না সেই ছোটবেলার মতো?

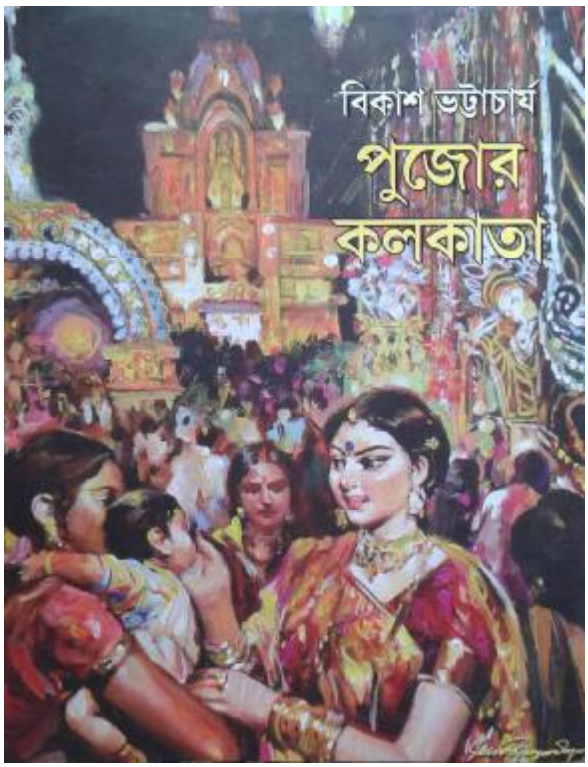

প্রশ্নগুলোর উত্তর এর আগেও আর একজন খুঁজেছেন। খুঁজেছেন শিল্পীর চোখ দিয়ে, শিল্পী-মনের দরদ দিয়ে। আর তাই সেই অনুসন্ধান যেমন রসগ্রাহী হয়েছে তেমনই শিল্পীসুলভ সুক্ষ্মতাও এসেছে তাতে। তিনি বিকাশ ভট্টাচার্য। তাঁর বই ‘পুজোর কলকাতা’ পড়তে পড়তে এমন অনুভূতিই হয় যে, একা আমি নই আরো কেউ কেউ ভোগে একটা অতৃপ্তিতে। বোঝে আনন্দ ঠিক কোথায় থেকে আসে, বোঝে আনন্দের উৎস শুধু হুল্লোড় নয়।

যদিও মূলত কলকাতার পুজোর বিবর্তনের কথা বলা আছে আলোচ্য বইতে, কারণ শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের পরিচয় তিনি একজন আদ্যন্ত কলকাতাবাসী। কিন্তু তাঁর চোখ যে বিবর্তন, পরিবর্তন দেখেছেন সেটা যেমন কলকাতার পুজোর বিবর্তন তেমনই কলকাতা বাদে বাকি বাংলার পুজোরও বিবর্তনও বটে। যেমন তিনি বলছেন, ‘কে যেন সেদিন বলছিলেন, বাঙালির জীবন থেকে বহু কিছু চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে পারিনি। বরং মনে মনে নিজেই একটা তালিকা তৈরি করেছিলাম। এই হারিয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া, তলিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কবে থেকে শুরু হল কে জানে! অনেকে বলেন, ষাটের দশকের গোড়া থেকে। বিষয়টাকে অর্থনীতির নিরিখে বিচার করে তাঁরা বললেন, এক আনা, দু’আনা, চার আনা, ষোল আনার

বদলে নতুন দশমিক পদ্ধতির টাকা-পয়সা যখন ধেয়ে এলো, অচল হয়ে গেল তামার পয়সা, ফুটো পয়সা, তখন থেকেই বাঙালির মানসিকতা পরিবর্তিত হয়ে গেল ব্যাপকভাবে। যাকে বলে পজিটিভ চেঞ্জ। কথাগুলো আমার মনে ধরেছে। অন্তত পুজোটুজো নিয়ে যখন ভাবি, তখন দেখি কোথায় গেল সেই পাঁচ সিকে পাঁচ আনার পুজো, ষোল আনার মানত কিংবা প্রণামীর থালায় তামার পয়সা ছুঁড়ে দেওয়ার অনির্বচনীয় শব্দ! অর্থনীতি যে আমাদের দাপিয়ে নিয়ে, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। সে দশমিক পদ্ধতির অর্থনৈতিক সচেতনতাই হোক কিংবা মেট্রিক পদ্ধতির বাণিজ্যায়ন!'

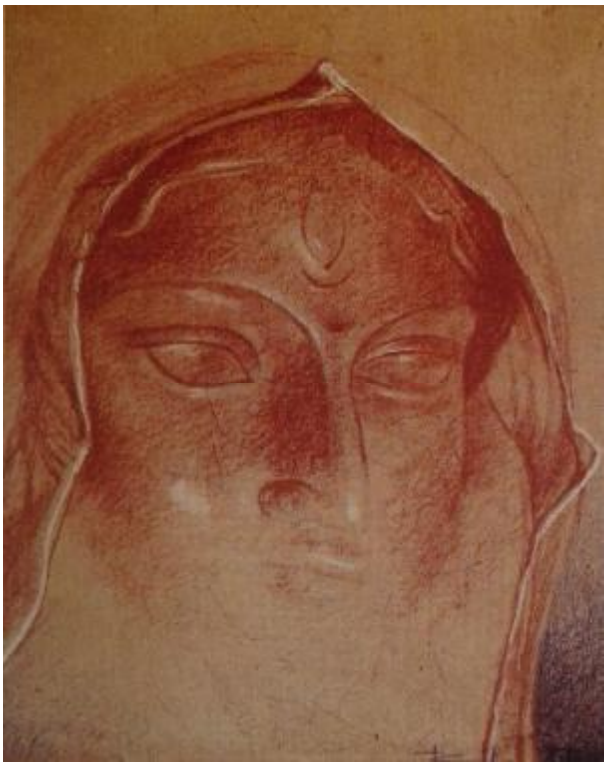

পুজোর স্মৃতিচারণে প্রথমেই যেটা মনে আসে সেটা আগমনী গান। আজকাল আর আগমনী গান শুনতেই পাওয়া যায় না। পুজোর নিজস্ব আগমনী গান গেছে, গ্রামোফোনের পর ক্যাসেট-সিডির সঙ্গে সঙ্গে পুজোর গানটাও গেছে। আর এখন গান ব্যাপারটাইতো চলে গেছে। এখন শুধু শব্দদৈত্য তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে লম্ফঝম্প করে দেদার হুল্লোড়ে। বিকাশ ভট্টাচার্যও তার ছোটোবেলার আগমনী গানের স্মৃতি খুঁড়ে বের করেছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না। / বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।। / যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয় – / এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।।' এই গানও একদিন কলকাতা তথা বাংলা থেকে মুছে গেল। দুর্গাপুজো আসে, কিন্তু কোথাও আগমনী গান তো দূরের কথা হিন্দী গান ছাড়া আর কিছু বাজে না। পুজো, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পিকনিক, হুল্লোড় – সবেতেই একই গান। একই তার মেজাজ।

আর পুজোর শুরু হতো মহালয়ায়। আজও হয়, কিন্তু কতটা আলাদা। আজ আর মহালয়ার ভোরের রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠ কারো মনে আবেশ তৈরী করে না। কিন্তু একটা সময় মানুষ পাগল থাকত এই কণ্ঠের জন্য। যেমন বিকাশের ছোটবেলায়। 'চতুর্দিকে তখনও অন্ধকার। মা ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। কাল ভোরে মহালয়া শুনবো – এই উত্তেজনায় রাত্রে ভালো ঘুমও হত না হয়ত। তখন তো ঘরে ঘরে ট্রানজিস্টার রেডিওর এমন চল ছিল না। বালব লাগানো, এরিয়াল ঝোলানো ঢাউস সব রেডিও। আমাদের সামনের বাড়ির এক ভদ্রলোকের রেডিওর দোকান ছিল। তিনি মহালয়ার আগের দিন,

দোকান তেকে দুটো রেডিও নিয়ে এসে নিজের বাড়ির বসার ঘরে গুছিয়ে রাখতেন। আমরা সবাই এসে জুটতাম। স্বপ্নের মহালয়া শুরু হত।'

আর সেখান থেকেই শুরু হয়ে যেত পুজো। কিন্তু বিকাশের পুজো শুরু হতো আরো আগে। তার ছেলেবেলায় পুজো শুরু হতো রথের দিন থেকে। রথের দিন শোভাবাজার রাজবাড়ির উঠোনে কাঠামো পুজো হতো। আর সেদিন থেকেই বিকাশের মনের মাঝে শুরু হয়ে যেত পুজোর প্রস্তুতি। সেদিন থেকেই অধৈর্য হয়ে ওঠার পালা ছোট্ট বিকাশের।

এই পুজোও পাল্টে গেছে। রথের দিন থেকে তো অনেক দূরের। এখন কি ষষ্ঠী বা সপ্তমীতেও মন কেমন করে উমার জন্য? কাশফুলের আর শিউলির শরৎ কি মনের মাঝে সেই দোলা তৈরি করে এখনও? কিন্তু এই পাল্টে যাওয়া তো একমুখী নয়। পাল্টে গেছে পুজোর ফ্যাশন, পুজোর ধরণ সবকিছুই। ফ্যাশনে রেডিমেড পোষাকের চল এতটাই বেড়ে গেছে যে পাড়ায় পাড়ায় যে সব দর্জির দোকানগুলো ছিল সেগুলোর অধিকাংশ এখন উঠেই গেছে। বিকাশের 'পুজোর কলকাতা'-য় এই পরিবর্তনেরই একটা ছবি পাই আমরা। তাঁর ছোটবেলার পুজোর ফ্যাশনের স্মৃতি বলতে থান কিনে দর্জির দোকানে দিয়ে বানানো মাপসই সুতির জামা-কাপড়। যেটা একটু একটু করে গ্রাস করে নিয়েছে রেডিমেড পোষাক বিপ্লব। আর রেডিমেড পোষাকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিন্দি সিনেমামার্কা বৈচিত্র্য।

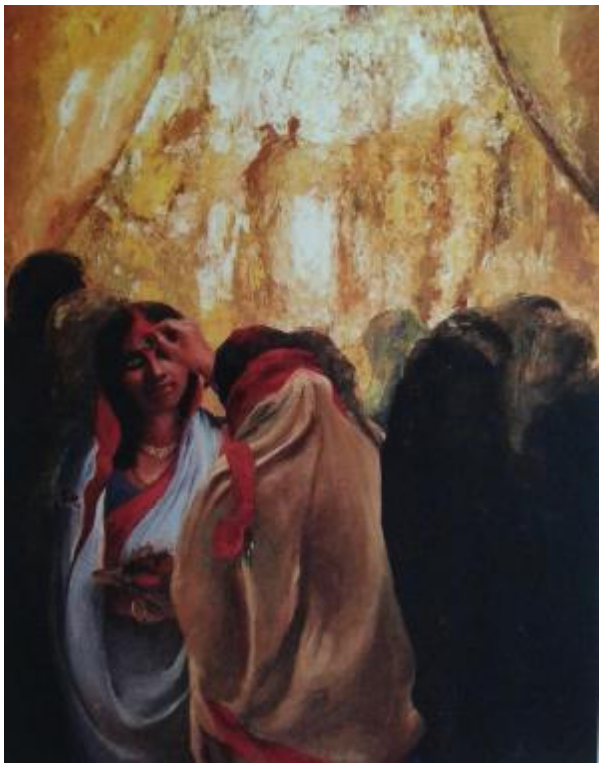

এভাবেই পাল্টেছে মণ্ডপ-সজ্জা, প্রতিমা-সজ্জা, শৈলী। এমন কি পারিবারিক পুজো থেকে বারোয়ারী পুজোর পরিবর্তন ও তার রমরমা শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। তিনি তাঁর বইতে বলছেন: 'এরপর এল পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত মনুমেন্টের অনুকরণে তৈরি প্যাণ্ডেলের জোয়ার। সে আরও বীভৎস। অনেকেই সেদিন বাহবা দিলেন – দেখেছ, সামান্য কারিগর কাপড় আর কাঠ দিয়ে কী অভাবনীয় কাজ করেছে! আমি কোনওদিনই এগুলোকে দেখে উল্লসিত হইনি। বরং ভেবেছি, যে-শিল্পীরা এমন অনুকরণ করতে পারেন, তাদের দিয়ে কোনও মৌলিক শিল্পিত কাজ করালে ক্ষতি কি হত!'

পুজোর ক'টা দিন আনন্দে আর মেতে উঠতে পারি না। ছোটোবেলার সেই মজা, সেই আনন্দ আর পাইনা। বিশাল বিশাল মণ্ডপের সামনে লম্বা লম্বা লাইন ঠেলে জৈলুসপূর্ণ প্রাণহীন সেই পুজো দেখা আর ছোটোবেলায় আমার গ্রামের বা মামার বাড়ির গ্রামের সেই

ডাকের সাজের মাতৃগন্ধময় পুজো – এদুটোর মধ্যে কোনো মিল পাইনা আমি। পুজোর দিনগুলোতে তাই আমার কাছে মণ্ডপমুখী হওয়ার চেয়ে বিকাশ ভট্টাচার্যের দুর্গা সিরিজের ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকা অনেক বেশি সুখকর, স্বস্তিদায়ক। এই ছবিগুলোর মধ্যে খুঁজে পাব আমার পিছনে ফেলে আসা সেই ছোটবেলার পুজোগুলোর একটা আবছা চেহারা।

'ফেলে আসা দিনগুলোর সঙ্গে এখনকার পুজোর তুলনা করলে মন খারাপ হয়ে যায়। অনেক কিছুই মেলে না। ঐতিহ্য শব্দটাকে নড়বড়ে মনে হয়। আবার এ কথাও ঠিক, দুর্গাপুজোকে আমাদের জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিলে বাঙালির সংস্কৃতি বলে আর কিছুই থাকবে না।' আসলে দুর্গাপুজো বাঙালির জীবনে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু যেখানে বাঙালিই পাল্টে গেছে গ্লোবালাইজেশন নামক এক ছায়াময় তত্ত্বকথায় পা মেলাতে সেখানে তার জীবনের অঙ্গ দুর্গাপুজো পাল্টাবে না এমন আশাকরাটাইতো বোকামি।

পুজোর কলকাতা :: বিকাশ ভট্টাচার্য :: সুতানুটি বইমেলা কমিটি :: প্রথম প্রকাশ – দেবীপক্ষ ১৪২০, ৫ অক্টোবর ২০১৩ :: প্রচ্ছদ শিল্পী - সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় :: পরিবেশক – সূত্রধর ও স্টার ওয়ার্ল্ড বুক সেন্টার :: দাম – ২০০ টাকা।

সঙ্গের সমস্ত ছবির শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য।